

বিবেকানন্দ

এম এল দে এণ্ড কোং
১৩-১ কলেজ স্কোয়ার
ক লি কা তা

স্বামী বিবেকানন্দ



কে ?

“সাপ, সাপ !”

সারা বাড়ির লোক সকলে সন্ত্রস্ত। মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট। কেহই সাহস করছেন না বিষধর সাপটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার কালগ্রাস থেকে বালককে রক্ষা করতে,—যদি ছোবল মারে।

বালক চোখ বুজে চুপ করে বসে আছে—ভয় নেই। তার কানেই যাচ্ছে না—এত সব হৈ চৈ।

তার খেলার সাথীরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—হে ভগবান, আমাদের সাথীটিকে বাঁচাও, তাকে যেন সাপে না কামড়ায়।

মা, কত আরাধনা করে পাওয়া ছেলের এ রকম অবস্থায় জ্ঞানশূন্য। তাঁর দেহে প্রাণ আছে কিনা বুঝা যায় না। চোখ তাঁর পলক হীন। পুত্রের মঙ্গল কামনায় হাত দুটি যুক্ত।

সাপ ধীরে ধীরে সরে গেল তার বিশাল ফণাটি বালকের মাথার ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন

সবাই। বালকের এবার জ্ঞান ফিরে এলো। চারি দিকে চেয়ে দেখলো—বাড়ির আর পাড়ার লোকে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বালক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সকলের দিকে। সে বুঝতে পারলো না কি ঘটেছিলো।

পরে যখন সে সব ব্যাপার শুনলো—তখন সেও যে একটু অবাক না হয়ে গেল এমন নয়! এই যে আপনভোলা বালক, এ কে জান?—ইনিই তোমাদের স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর ছোটবেলাকার নাম—নরেন্দ্রনাথ।

জন্ম ও নামকরণ –

আজ থেকে ছিয়াশী বছর আগেকার কথা। সেদিন পৌষ সংক্রান্তি। বাঙালীর ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব।

কলিকাতা শহর। শিমুলিয়া বা শিমলা একটি পল্লী। এখানকার দত্তরা বেশ নামকরা ও পয়সাওয়ালা। এঁদের ঘরেও আজ মহা আনন্দ-কলরব উঠলো জেগে।

১৮৬৩ সালে ১২ই জানুয়ারী ভোর ছ'টায় ভূমিষ্ঠ হলো এক শিশু—শিবের মত ঘর আলোকরা তার রূপ।

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত আর মাতা ভুবনেশ্বরী। পিতা উকিল। পসার আছে যথেষ্ট। সংসার চলে যায় সহজ সরল ভাবে। পয়সা তিনি উপায়ও করতেন যেমন, সে পয়সা উপভোগ করার ইচ্ছাও ছিল তেমনি। যা' হো'ক বিশ্বনাথ বাবুর গুণ ছিল প্রচুর। তিনি ছিলেন—উদার, স্বাধীন চিত্ত, আত্মীয় বা আশ্রিত-প্রতিপালক আর বন্ধু-বৎসল ও জাঁক জমক প্রিয়!

মা ভুবনেশ্বরী ছিলেন—হিন্দু ঘরের মেয়ে। বারমাস পূজা-অর্চ্চনা নিয়ে থাকতেন। দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল অগাধ। তাঁর জন্মাল—পর পর দুটি মেয়ে। তাই কাশীর বিশ্বনাথের কাছে তিনি জানালেন—একটি-পুত্রের কামনা। তার পর হলো এই ছেলে—যে ছেলের কথা তোমরা আজ পড়ছো।

মুখে-ভাতের দিন এগিয়ে এলো। খুব ধুমধাম করে নাম করণও হলো—শ্রীনরেন্দ্র নাথ। আর মহাদেবের আশির্ব্বাদ স্মরণ করে তাঁর আর এক নাম রাখা হয়েছিল—বীরেশ্বর।

শিশু-স্বভাব—

খুব ছোট বেলায় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারী দুষ্টু। তিনি একাই সারা বাড়িখানাকে—সজাগ করে রাখতেন। কেউ কখন তাঁকে চোখে চোখে রাখতে পারতো না। সকলেই তাঁর অত্যাচারে হয়ে উঠতো—অতিষ্ঠ!

অন্যে তো হতেই পারে! মা পর্য্যন্ত এত বিরক্ত হয়ে পড়তেন যে, তিনিও সময় সময় বলতেন—"মহাদেব, নিজে না এসে, পাঠিয়ে দিয়েছেন একটা ভূত!"

কিন্তু ভারী মজা। তাঁকে শান্ত করার একটা ওষুধ ছিল—অতি চমৎকার! যখন তিনি কোন কিছু আবদার ধরে কান্নাকাটি করতেন। কোন উপায়েই তাঁকে প্রবোধ দেওয়া যেত না, তখন যদি তাঁর মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢেলে দেওয়া হত আর বলা হত 'শিব শিব'। তা হলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

তিনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন খুব! প্রায় রোজ দুপুর বেলা তাঁদের বাড়িতে মহিলা মজলিস্ বসতো। একজন বৃদ্ধা শুনাতেন পুরাণের গল্প, আর সকলে শুনতেন সেসব। বালক নরেন্দ্র খুব দুষ্টু হলেও—এ সময় কিন্তু তিনি শান্ত ছেলেটির মতো চুপ করে বসে বসে বৃদ্ধার—কাহিনীগুলো যেন গিলে ফেলতেন। তাঁর হয়ে যেত সব মুখস্ত!

শুধু তাই নয়! রাত্রে আবার মার কাছে চলতো তাঁর এই সব গল্প বলার আব্দার। মাও তাঁকে শুনাতেন আবার একটার পর একটা: তিনি পছন্দ করতেন—সীতারামের কাহিনী আর রামের উপর হনুমানের ভক্তি!

লেখাপড়া

দেখতে দেখতে নরেন্দ্রনাথের বয়স হলো পাঁচ বৎসর! একটি ভাল দিন দেখে তাঁর হাতেখড়ি হলো। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে হলো তাঁর বর্ণ-পরিচয়। এর পর তিনি ভর্ত্তি হলেন—মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে, এবার তাঁর বন্ধু জুটলো অনেকগুলো। ক্লাশের ছেলেরা রোজ সকালে আর বিকেলে এসে জমতো সিমলার দত্তবাড়িতে। তাঁদের খেলা-ধুলা চলতো—মহা আনন্দ কলরবের মধ্যে।

শাসনের ভয়ে ভীত হতেন না তিনি। তাঁকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে—পড়া আদায় করে নিতে হতো। শাসন করলেই বেঁকে বসতেন তিনি।

দেখতে দেখতে চোদ্দ বছর কেটে গেল। এবার তিনি পেটের অসুখে ভুগতে থাকলেন খুব! পিতা বিশ্বনাথবাবু তাঁদের নিয়ে গেলেন—রায়পুরে। রায়পুর মধ্য প্রদেশে।

এখানে ইস্কুল কলেজ তখন ছিল না। নরেন্দ্রকে পড়ানোর ভার পড়লো পিতার উপর। পিতা তাঁকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতেন। এতে নরেন্দ্রনাথ শিখলেন—বহু নূতন বিষয়। পিতার সদ্‌গুণগুলির বীজও রোপিত হলো তাঁর চরিত্রে।

যা'হোক এখানে যেমন তাঁর লেখাপড়া চলতে লাগলো পিতার কাছে। তেমনি স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্যও চললো—নিয়মিত ব্যায়াম। কয়েক মাসের মধ্যেই শরীর সেরে উঠলো। শরীরে শক্তি এলো ফিরে! তখন আর তাঁকে পনের বছরের—কিশোর বলে মনে হয় না—তিনি যেন বিশ বছরের যুবক!

দু'বছর কাটলো রায়পুরে!

তারপর তিনি ফিরলেন—কলিকাতায়। গোড়া থেকেই তিনি ছেলে ছিলেন—ভালো। তাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক

মহাশয়েরা প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি করে নিলেন।

১৮৭৯ সালে পরিক্ষায় পাশ করলেন প্রথম বিভাগে।

তিনি যে শুধু লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন—তা নয়। তাঁর গলা ছিল মধুর—গান গাইতে পারতেন অতি সুন্দর! কুস্তির আখড়ায়ও তাঁর যাতায়াত ছিল—তাই দেহেও শক্তি ছিল প্রচুর। তখনকার দিনে কিন্তু গান বাজনা করা আর কুস্তি করা ছিল ছাত্রদের পক্ষে এক নিন্দনীয় ব্যাপার!

যা'হোক তিনি কলেজে পড়তে লাগলেন—জেনারেল এসেম্বলীস্ কলেজে। তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর, বুদ্ধি ছিলো তীক্ষ্ণ, দেহ ছিল সুগঠিত। পড়াশুনায়ও তিনি ছিলেন ভালো। তাই তাঁর অধ্যাপকেরা আর তাঁর সহপাঠীরাও তাঁকে ভাল বাসতেন খুব। তিনি কোন সহপাঠীর অন্যায় বা অযথা বিলাসিতা দেখলে তার সমালোচনা করতেন কঠোর ভাবে। এতে কিন্তু কেউ তাঁর ওপর রাগ করতো না। তিনি সবার মুখের ওপর যা' বলতেন—তা কখনও কাহাকেও লুকিয়ে কিছু তিনি বলতেন না।

নরেন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল—তিনি যখন যে কাজ করতে চাইতেন তা' না করে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। কলেজে পড়ার সময় তাঁর চিন্তা জাগতো মনে—তিনি কে? ইশ্বর কে? তিনি কোথা হ'তে এসেছেন?—ইশ্বর বলে কেউ আছেন কি না? ইত্যাদি! এসব প্রশ্নের সমাধান করার সুযোগ ঘটলো, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁর পরিচয় হবার পর থেকে!

তারপর তাঁর পিতার যখন মৃত্যু হলো—তখন তিনি বি-এ পাশ করেছেন।

সাহসিকতা ও পরোপকারিতা

আমাদের ছেলেরা ভূতের বা জুজুর নামে ভয় পায়। নরেন্দ্রনাথ সে ধরনের ছেলে ছিলেন না। তাঁর বুকে সাহস ছিল

প্রচুর। একটা গল্প বলি শোন।

নরেন্দ্রনাথের এক প্রতিবেশী খেলার সাথীর বাড়িতে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। তিনি সাথীর বাড়ি গিয়ে চাঁপা গাছে উঠে একটা ডালে পা বাঁধিয়ে দিয়ে—মাথা আর হাত নীচু করে দোল খেতেন। গৃহস্বামী ব্যাপার দেখে একটু চিন্তিত হলেন—কবে হয় তো পা ফস্‌কে পড়ে গিয়ে ছেলেটা জখম হবে। তাই তিনি তাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ঐ অদ্ভুত খেলা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না—গৃহস্বামীর কথা। তিনি তাঁর খেলার সাথীকে জানালেন—তোর দাদু, আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে ভূতের গল্প বলেছেন। ভূতটুত কিছু নেই রে!

যখন তিনি ছ'বছরের ছেলে, তখন একদিন চড়কতলার মেলা থেকে বাড়ি ফিরছেন—হাতে আছে একটি মহাদেব। এমন সময় একটা ছোট ছেলে 'ফুটপাথ' দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে রাস্তায় পড়লো নেমে। তখন হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে পড়লো—ছেলেটীর ওপর আর কি! বালক নরেন্দ্রনাথ মহাদেবকে বগলে না পুরে ছুটে পথে নেমে পড়ে' ছেলেটাকে টেনে আনলেন ঘোড়ার পায়ের ঠিক সামনে থেকে। পথের লোকে এতটুকু ছেলের এমনি সাহস দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে!

মা যখন শুন্‌লেন তাঁর ছেলের এমন সাহসের কথা, তখন তিনি তাঁকে চুমু খেয়ে বললেন—বাবা এমনি করে, মানুষের মত কাজই তুমি ক'রো চিরকাল!

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এলেন কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে। নরেন্দ্রনাথের সেখানে ডাক পড়ল—তাঁকে গান শোনাবার জন্য। তাঁর সুমিষ্টকণ্ঠের গান শুনে তিনি পেলেন পরম তৃপ্তি। তাঁকে ঠাকুর বল্‌লেন—দক্ষিণেশ্বরে তাঁর

আশ্রমে যেতে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সে সময় এফ-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করছেন, তাই তার কালীবাড়ী যাওয়া ঘটে উঠলো না।

তারপর একদিন তিনজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্র দু'তিনটি গান গাইলেন সেখানে। ঠাকুর হলেন ভারী খুসী। ঠাকুর তাঁকে বললেন,—নরেন তুই আমাকে এতদিন কেমন করে ভুলে ছিলি বলতে পারিস? তোর সঙ্গে কথা বলে আমি মনে খুব শান্তি পাই। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলে আমি মোটেই সুখ পাই নে।

ঠাকুর যখন এ সব কথা তাঁকে বলছিলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরছিল—স্নেহাশ্রু।

নরেন্দ্রনাথ সেদিন বাড়ি চলে এলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—কেন তিনি আমাকে এভাবের কথা বললেন। আমার মধ্যে কি দেখতে পেলেন। কেন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো—কিছুই তো বুঝতে পারছিনে। তিনি কি প্রকৃতই ইশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছেন?

এর পর থেকে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যেতেন, তাঁর সঙ্গে নানা রকম দার্শনিক বিষয়ের কথোপকথন হতো। ঠাকুর কঠিন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন অতি ছোট ছোট কথায় আর উপমায়। ভারী ভালো লাগতো নরেনের। তাঁর মন ক্রমশঃ ভক্তিতে নতি স্বীকার করলো ঠাকুরের পায়ের গোড়ায়। তবু একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রশ্ন করে বললেন—ঠাকুর আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

ঠাকুর কোনরূপ চিন্তা না করে সহজ সরল ভাবে উত্তর দিলেন—দেখেছি রে দেখেছি, যেমন তোকে দেখছি আমার সামনে বসে কথা বলতে, তেমনি দেখেছি তাঁকেও। তুই দেখতে চাস্ নরেন? তোকেও দেখাতে পারি আমি। তবে তোকে

আমার কথা মত চলতে হবে আর কাজ করতে হবে।

এতবড় কঠিন প্রশ্নের এমন সরল উত্তর শুনে নরেন্দ্র তো একেবারে অবাক্! তিনি আর ঠাকুরের কাছে গর্ব্বভরা বুকে দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি এবার তাঁর সমস্ত মনটাকে দিয়ে দিলেন ঠাকুরের পায়ে। এইদিন হলো তাঁর প্রকৃত দীক্ষা।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন অনেক। নরেন্দ্রনাথ তাঁর উপদেশগুলো মনের মধ্যে যেন গেঁথে নিলেন, আর সেই ভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন।

লেখাপড়ার চাপে অনেক সময় নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা শুনা করতে যেতে পারতেন না। তাই ঠাকুর আসতেন কলকাতায়, তাঁর পরম ভক্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। ঠাকুর তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কাছেও তাঁর প্রশংসা করে বলতেন —নরেন বড় ভাল ছেলে। সে নারায়ণ।

নরেন্দ্রনাথ যখন বি-এ পাশ করে আইন পড়ছেন, তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। তিনি ছিলেন খুব খরচে, দানে মুক্তহস্ত। তাই তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বিধবা মা ও ভাইবোনদের নিয়ে মহা কষ্টে পড়লেন। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তিনি চেষ্টা করলেন খুব—কিন্তু চাকুরী তাঁর জুটলো না। তারপর কোন রকমে কেটে যেতে লাগলো তাঁদের দিনগুলো—দুঃখে সুখে।

যেদিন তিনি আইন পরীক্ষার ফি-এর টাকা জমা দিতে গেলেন, সেদিন তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠলো ভারতবর্ষের দুঃখ ও সুখের কথা। তিনি টাকা জমা দিলেন না। ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে। তিনি তাঁর পরামর্শ নিলেন—কি করা কর্ত্তব্য। ঠাকুর তাঁকে জানালেন—নরেন তুমি মানুষ নও, তুমি নারায়ণ। তুমি শুধু তোমার উন্নতির জন্য স্বার্থ-পরের মত অর্থ উপার্জ্জন করলে চলবে না। তোমাকে সারা

ভারতের, সারা পৃথিবীর লোকের জন্য কাজ করতে হবে। তোমাকে চিন্‌তে হ'বে ভগবানকে। তোমাকে করতে হবে দেশের ও দশের কল্যাণ। তোমাকে সারা জগতের লোককে জানাতে হবে—ধর্ম্ম সবই সত্য। যে কোন ধর্ম্মের লোকই হোক না কেন, সে যদি শুদ্ধ ভাবে থেকে নিজ নিজ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ মত কাজ করে, তবে শ্রীভগবান সকলকেই দয়া করবেন। তাই আমি তোমার উপর দিচ্ছি এই দায়িত্ব। এই সত্য প্রচার করতে হবে তোমাকে সারাবিশ্বে।

ঠাকুরের কাছে শক্তি লাভ করে নরেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে খাট্‌তে লাগলেন দেশের কাজে—ভগবানের কৃপা লাভ করবার সাধনায়। তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই হলেন বিরূপ! তাঁরা বললেন—নরেন যদি ওকালতী পাশ করে নিজের ব্যবসা করতো তা হলে সে অনেক টাকা উপায় করে সুখে সংসারযাত্রা চালাতে পারতো!

কিন্তু জগতের লোকের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত করার বাসনা জেগেছিল তাঁর মনে, তাই তিনি বাইরের কথায় কান না দিয়ে চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর—ধ্যান, ধারণা।

নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হলো কটা বছর। তারপর ঠাকুরের গলায় হলো ঘা। এটা ১৮৮৫ সালের কথা। চিকিৎসকেরা তাঁকে দেখলেন—নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁর যথেষ্ট সেবা করলেন কিন্তু তাঁর রোগ নিরাময় হলো না। বরং দিন দিন তাঁর রোগের যাতনা বেড়েই চললো।

ঠাকুর একদিন তাঁকে বললেন—তোর ভগবান দর্শন হবে। কিন্তু তুই শুধু তোর নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করলে মুক্তি পাবি নে। কাজ তোকে করতে হবে—জগদ্বাসীর জন্যে। শ্রীভগবানের স্নেহ লাভ করতে হলে—প্রথমে ভাল-

বাসতে হবে তাঁর সন্তানদের। তবে তাঁর অনুগ্রহ লাভ হবে।

ঠাকুর দেহ রাখলেন ১৮৮৬ সালে। এর পর তাঁরা বারোজন যুবক ঠাকুরের নির্দ্দেশ মেনে চলতে লাগলেন। তাঁরা হলেন সন্ন্যাসী। তাঁরা বরানগরে একখানা পুরাণো বাড়ি ভাড়া করে সেখানে বাস করতে থাকলেন।

এই বাড়িতে থাকার কালে তাঁদের কষ্টভোগ করতে হয়েছে বহুদিন। কোন কোন দিন তাঁদের কেটেছে মানকচুর পাতায় করে তেলাকুচা আর ভাত খেয়ে। তবু তাঁরা কোনদিন কোন লোকের কাছে সাহায্য নিয়ে ভালমন্দ খাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সারা দিনরাত তাঁদের চলতো ধ্যান, জপ, তপ, পূজা। ঠাকুরকে তাঁরা উৎসর্গ করতেন সামান্য কয়েকটা আতপ চাল মাত্র। আর তাঁদের কিছুই জুটতো না। কোন কোন দিন মধুর কীর্ত্তন জমে উঠতো তাঁদের ঘরে। পথের লোকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতো অমৃতময় সেই গান। এই ভাবতে দিন কাটতে লাগলো, আর একে একে ভক্তর সংখ্যাও তত বাড়তে লাগলো, কিছু কিছু করে।

বিবেকানন্দের ভারত পরিভ্রমণ

ভারতবর্ষকে জানতে হলে—ভারতকে দেখতে হ'বে। তা না হলে ভারতের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যাবে না। তাই বিবেকানন্দ যাত্রা সুরু করলেন ভারত ভ্রমণ করতে।

আর কোন গুরুভাইকে তিনি সঙ্গে না নিয়ে একাই রওনা হলেন। তিনি পদব্রজে গিয়ে হাজির হলেন কাশী। তাঁকে কাটাতে হলো কতদিন গাছতলায়, ভিক্ষা করে খেয়ে।

তিনি অযোধ্যায় গিয়ে সরযূ নদীতে স্নান করে পবিত্র হলেন। তারপর গেলেন পায়ে হেঁটে আগ্রায়। সেখানে দেখলেন শাজাহানের অমর কীর্ত্তি—তাজমহল।

তারপর তিনি বৃন্দাবন ও মথুরা ভ্রমণ করে দেখার মত

স্থানগুলো দেখলেন। আবার বার হলেন তিনি পদব্রজে। এ সময় তিনি একজন শিষ্য পেলেন—তাঁর নাম শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুপ্ত। ইনি ছিলেন যুক্তপ্রদেশের হাতরাস রেল ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। তিনি হলেন বিবেকানন্দের পরম সহায় এবং সম্বল। তিনি তাঁর নাম দিলেন স্বামী সদানন্দ।

এরপর তিনি হরিদ্বার হ'য়ে ঋষিকেশ গেলেন। এই নবদীক্ষিত যুবকটী তাঁর সঙ্গী হলেন। স্বামীজীর পিছু ছাড়লেন না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার ফিরে এলেন বরানগরে। দেশের লোকে অনেকদিন পরে তাঁকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এখানে দেড়মাস কাটাবার পর তিনি আবার গেলেন গাজীপুরে। এখানে থাকতেন বিখ্যাত জ্ঞানযোগী পওহারী বাবা। পওহারী বাবার সহিত তাঁর পরিচয় ও আলাপ আলোচনা হলো। হিমালয়ে আবার তিনি ঋষিকেশে তপস্যার জন্য গেলেন।

পরে তিনি হিমালয় পরিত্যাগ করলেন। এবার গেলেন পাঞ্জাবে। তারপর রাজপুতনায়। এখানে তাঁর সুযশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে লোক আসতে লাগলো তাঁকে দেখতে। আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ানজী ও মহারাজা তাঁর শিষ্য হলেন—তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে।

আলোয়ার থেকে বিবেকানন্দ গেলেন জয়পুরে। রাজ্যের প্রধান সেনাপতির সহিত তাঁর পরিচয় হলো। এখান থেকে তিনি আজমীর গেলেন—যে স্থান হিন্দু-মুসলমানের মিলনতীর্থ।

খেতরির রাজা মঙ্গল সিংহ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। কয়েক দিন পরে রাজা বাহাদুর ও মুন্সীও তাঁর শিষ্য হলেন।

তারপর তিনি আমেদাবাদ, লিম্বডি, ভোজ, জুনাগড়, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান দর্শন করে পোরবন্দরে গিয়ে হাজির

হলেন। পোরবন্দরের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হলো। তিনি স্বামিজীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। স্বামিজীও তাঁকে আচার্য্য বলে সম্বোধন করলেন। তারপর পণ্ডিতজী তাঁকে জানালেন—ভারত আপনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। আপনি সাগরপারে গিয়ে ইউরোপবাসীদের মধ্যে প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মমত প্রচার করুন। তারা পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা দেবে। তারপর আপনি ভারতে এসে ধর্ম্ম প্রচার করবেন।

এরপর বিবেকানন্দ গুজরাট, কাথিয়াবাড়, বোম্বাই ভ্রমণ সেরে চলেছেন পুণায়। রেলগাড়ীর মধ্যে তাঁর আলাপ হলো বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে। তিনি স্বামীজীকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাণ খুলে আলোচনা করলেন।

এরপর তিনি যান মহীশূর। মহীশূরের দেওয়ান ও মহারাজা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। বিবেকানন্দ যখন মহীশূর ত্যাগ করেন, তখন মহারাজা তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন। স্বামীজী তার কিছুই গ্রহণ না করে, নিলেন শুধু একটি চন্দন কাষ্ঠের হুঁকা। মহারাজ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের ব্যয়ভারও বহন করতে চেয়ে ছিলেন।

মহীশূর থেকে বিদায় নিয়ে কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য পরিদর্শন করলেন। তারপর গেলেন—মাদুরায়। শ্রীমীনাক্ষী দেবীর বিরাট মন্দীর দেখে তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। রাসনাদের রাজা ভাস্কর বর্ম্মাও তাঁর শিষ্য ছিলেন।

তারপর বিবেকানন্দ গেলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর। তারপর কন্যাকুমারীতে। এখান থেকে তিনি চার বছর পরে ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরলেন বরানগরে।

আবার তিনি ছুটলেন। পণ্ডিচেরীতে। এ স্থানটা ফরাসীদের। মাদ্রাজের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মন্মথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সেখানে তাঁর আলাপ হলো। তিনি তাঁকে মাদ্রাজে নিয়ে

গেলেন। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। এখানে কয়েকজন যুবক স্বামীজীর সেবাধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন।

ভারতের বাহিরে স্বামী বিবেকানন্দ

এই সময় আমেরিকার শিকাগো সহরে বিশ্বধর্ম্মসভার আয়োজন হচ্ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ পেলেন। বিবেকানন্দের শিষ্যরা স্থির করলেন, তাঁকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ থেকে পাঠান হবে আমেরিকায়।

ইতিমধ্যে খেতরির রাজা বাহাদুরের মুন্সী এসে হাজির হলেন মাদ্রাজে। তিনি সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন স্বামীজীর, আমেরিকায় যাতে তিনি ধর্ম্মসভায় যোগদান করতে পারেন।

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে জাহাজ ছাড়লো বোম্বাই থেকে। ভারত মহাসমুদ্র অতিক্রম করে—জাহাজ ছুটে চললো। তারপর প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে জাহাজ গিয়ে পৌঁছালো—বঙ্কুবর বন্দরে। রেলপথে স্বামীজী পৌঁছালেন শিকাগোতে।

তিনি ছিলেন সরল ও বিশ্বাসী। তাই স্থানীয় লোকেরা তাঁকে নানা উপায়ে ঠকিয়ে, তাঁর কাছ থেকে টাকা পয়সা লুটে নিতে লাগলো। তখনও তিনমাস দেরী—ধর্ম্মমহাসভা বসার। তার টাকাকড়ি এদিকে প্রায় ফুরিয়ে আসে আর কি ? বোষ্টনে যাবার পথে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। বৃদ্ধা তাঁর বাড়িতে স্বামীজীকে নিয়ে গিয়ে রাখেন। এখানে অধ্যাপক মিঃ রাইট বিবেকানন্দের গুণে মুগ্ধ হয়ে এমনভাবে একখানা পত্র লিখে স্বামীজীকে শিকাগোতে পাঠিয়ে দেন যে, ধর্ম্মমহাসভায় যাতে তিনি যোগ দিতে পারেন।

বিবেকানন্দ শিকাগোতে এসে হাজির হলেন রাতে। কোথায়ও তিনি থাকার বা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা শীতের রাতে তিনি ষ্টেশনে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের মধ্যে অনাহারে সারারাত কাটিয়ে—সকাল বেলায় এক মহাধনীর স্ত্রীর চোখে পড়ে তাঁর আশ্রয় পেলেন।

তারপর ধর্ম্মমহাসভার দিন ঘনিয়ে এলো। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। সভায় উপস্থিত হলেন তিনি—তাঁর প্রাণের মধ্যে যেন ভয়ের সঞ্চার হলো! যা হোক তিনি সুযোগ পেয়ে তা হারালেন না। তিনি সভার সবাইকে সম্ভাষণ করলেন—'হে আমার আমেরিকা-বাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ'—তাঁর এইরূপ সম্ভাষণে সকলে অবাক হলো। দেখতে দেখতে তাঁর নাম সারা জগতে ছড়িয়ে পড়লো। পৃথিবীর সকল কাগজে তাঁর গুণের কথার আর অন্ত নেই!

প্রত্যহ হাজার হাজার লোক আসতে লাগলো—স্বামীজীকে দেখতে, তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে—তাঁর দীক্ষা নিতে। তিনি এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করলেন প্রায় চার বছর ধরে। বিবেকানন্দ অনর্গল পড়ে যেতে পারতেন। তিনি পড়তেন একাগ্রচিত্তে। পড়ার সময় আর তাঁর কোন দিকে লক্ষ্য থাকতো না।

আমেরিকায় তিনি নিউইয়র্ক, বোষ্টন প্রভৃতি শহরে কয়েকটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করলেন। এখান থেকে হিন্দুধর্ম্ম এবং তার সভ্যতা প্রচার করা হতো।

বিবেকানন্দের স্বভাব ছিল মধুর। তিনি গরীবদের সঙ্গে মিশতেন খুব বেশী। তিনি তাদের ভালও বাসতেন প্রাণ খুলে।

ইংলণ্ডে মিস্ নোবেলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হলো। তিনি তাঁকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করলেন আর তাঁর নাম দিলেন —ভগিনী নিবেদিতা। এই পূতচরিত্রা মহিলা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রসারের জন্য আমরণ চেষ্টা করে গেছেন।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই লিখেছেন—বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল মানব জাতির প্রতি প্রেম, প্রগাঢ় ভালবাসা, অফুরন্ত দরদ। তাই তিনি হয়েছিলেন এত বড়।

তাঁর হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এক মহতী বাণী। তিনি ভারতের তরুণদের আহ্বান করে বলেছিলেন—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল,—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। * * ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

দীর্ঘ চার বৎসর পরে তিনি ফিরলেন ভারতে, ভারতবাসীর মঙ্গল বিধান করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

আবার ভারতে বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ কলিকাতায় ফিরে এসে আলমবাজারে বাস করতে থাকলেন। এখানে অনেক শিক্ষিত যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। তাদের কয়েকজনকে তিনি দীক্ষা দিলেন—তারা হলো সন্ন্যাসী। তারা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করলো। তারা সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করলো।

দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য বিবেকানন্দ স্থাপন করলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়লো। শিষ্যরা তাঁকে হিমালয়ে আলমোড়ায় পাঠিয়ে দিল। তিনি ১৮৯৮ সালে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। এবার তিনি বেলুর মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে তরুণ সন্ন্যাসীদের থাকার আর পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করা হলো।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন—মানুষ তৈরী করতে—ধর্ম্মপ্রচার করতে। মুচি, মেথর, সকল জাতির লোককে ভাল বাসতে।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই। পরদিন শনিবার অমাবস্যা। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঐ দিন তিনি কালীপূজা করবেন। তাঁর শিষ্যরা গুরুভাইয়ের বাসনা পূর্ণ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। সন্ধ্যার পরে আজ বিবেকানন্দ তাঁর নিজের ঘরে ঢুকলেন। তারপর কিছুক্ষণ গঙ্গা আর দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ধ্যানে বসলেন।

রাত্রি ন'টার পর তাঁর ধ্যান শেষ হলে, তিনি মাদুর পেতে শয়ন করলেন। তাঁর আদেশে একজন ব্রহ্মচারী তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন। শায়িত অবস্থায়ও তিনি জপ করছিলেন; সহসা তাঁর হাত কেঁপে উঠলো। তিনি ঘুমন্ত শিশুর মত উঠলেন কেঁদে। ব্রহ্মচারী চীৎকার করে উঠলো। আর আর সকলেই তখন ছুটে এলেন—স্বামীজীর ঘরে। তাঁরা দেখলেন, বিবেকানন্দ মহা সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর।

হে বাঙ্গলার ছেলেরা, তোমরা স্বামীজীর শিক্ষা গ্রহণ কর, তাঁর আদর্শ মেনে চলো—গরীব, পতিত, মুচি, মেথরকে ভালবাসতে শেখ। তাদের মুখে তোমরা ভাষা দাও, হাসি ফুটাও। নরকের পথ থেকে তাদের হাত ধরে তোমরা টেনে তোলো—তোমাদের জন্ম হোক সার্থক, তোমরা হও ধন্য। জগৎ গ্রহণ করুক তোমাদের আদর্শ।

ওঁ

মূল্য আট আনা মাত্র